জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও প্রশাসনিক সন্ত্রাস

মালিহা মোস্তফা সূচনা, অলিউর সান, সরদার জাহিদ, নজির আমিন চৌধুরী জয়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডল নির্ধারণ ও নির্মাণে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন-সংগ্রাম সেই ৫২ থেকে ৬২, ৭১ থেকে ৯০, ২০১৩ থেকে বর্তমান পর্যন্ত জারি আছে। শিক্ষার্থীদের এই সংগঠিত শক্তি বারবার স্বৈরাচারী সরকারের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে। ফলে ক্ষমতালোভী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে স্বৈরশাসকেরা শিক্ষার্থী রাজনীতির টুঁটি চেপে ধরেছে বারবার-কখনও অপরাজনৈতিক পন্থায় দলের সহ শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে কিংবা কখনও ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে শিক্ষার্থীদের যুথবদ্ধ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীরা ফুঁসে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। ক্ষমতাসীনরা তাই শুধু 'হেইট পলিটিক্সের' বীজ বপন নয়, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগের স্থানগুলো হয় নষ্ট করেছে নয়তো নিপীড়ন মূলক সংস্কৃতির মাধ্যমে দখল করেছে। কারণ সংগঠিত শিক্ষার্থী মানেই নিপীড়নমূলক ক্ষমতার জন্য হুমকি। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান চিত্রের দিকে তাকালে এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। যার সর্বশেষ উদাহরণ স্থাপিত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

> ক্ষমতাসীনরা তাই শুধু 'হেইট পলিটিক্সের' বীজ বপন নয়, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগের স্থানগুলো হয় নষ্ট করেছে নয়তো নিপীড়নমূলক সংস্কৃতির মাধ্যমে দখল করেছে।

গত ২৬ মে, ২০১৭ তারিখ আনুমানিক ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সিএন্ডবি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। একজন পথচারীর মুঠোফোনে ধারণকৃত ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, দীর্ঘসময় নিহত শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে পড়ে থাকলেও কেউ উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেনি। পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পথচারীদের সহযোগিতায় তাদের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাজমুল হাসান রানাকে মৃত ঘোষণা করেন ও মেহেদী হাসান আরাফাতকে গুরুতর আহত হিসেবে সনাক্ত করেন। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হওয়ার পূর্বেই আরাফাত মৃত্যুবরণ করেন। নিহত শিক্ষার্থীদের লাশ এনাম মেডিকেল কলেজে রাখা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিবারের ইচ্ছার কথা তুলে তাদের জানাজা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হতে না দেয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নিহতদের সহপাঠী, বন্ধু ও পরিচিতজনরা নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ নিরাপদ সড়কের দাবীতে ওই দিনই ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী ছাত্র সংগঠনের হুমকির মুখে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। পরের দিন ২৭মে একই দাবী নিয়ে নিহতদের বন্ধু, সহপাঠীসহ ক্যাম্পাসের আপামর শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তাসহ ছয় দফা দাবীতে সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন নস্যাৎ করতে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী ছাত্রসংগঠন দুপুর ১২টা নাগাদ আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায়। এতে শিক্ষার্থীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রথম দফায় আন্দোলনকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে পূর্বলিখিত ছয় দফা দাবী পেশ করা হয়। যাতে উপাচার্য স্বাক্ষর করেন ও আন্দোলনকারীদের দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দীর্ঘদিনের আশ্বাসসর্বস্বতায় আস্থাহীন শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষনিক কাজ শুরুর দাবী জানান। পাশাপাশি আন্দোলনে যারা হামলা চালিয়েছে তাদের বিচারের দাবী তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসব দাবি উপেক্ষা করে দ্রুত আন্দোলনস্থল ত্যাগ করেন। ফলে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনড় থাকেন। উপাচার্যের ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পর পরই ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা দ্বিতীয় দফায় বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায়। এতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, আন্দোলন প্রত্যাহার না করায় উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্বিতীয় বারের মতো আন্দোলনস্থলে উপস্থিত হন। পূর্ব লিখিত ছয় দফা দাবীর সাথে আন্দোলনে হামলাকারীদের বিচার চেয়ে মোট সাত দফা দাবী উপাচার্যের কাছে পেশ করা হয়। আন্দোলনকারীদের সাথে দাবী নিয়ে উপাচার্যের কথোপকথনকালে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি দল লাঠিসোঁটা নিয়ে আন্দোলনকারীদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। উপাচার্যের উপস্থিতিতেও এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা আতঙ্কগ্রস্ত ও সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে উপাচার্য হামলা করতে এগিয়ে আসা দলটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের নিবৃত্ত করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কাছে ফিরে এসে তাদের পুনরায় আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে এবং উপাচার্য তাদের ক্ষোভের মুখে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের আহ্বানে আন্দোলনকারীদের পক্ষ হতে একটি প্রতিনিধি দল উপাচার্যের বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে যান।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনওর উপস্থিতিতে প্রতিনিধিদলের সাথে উপাচার্যের সাক্ষাৎ চলাকালীন সময়ে আন্দোলনস্থলের দুইপাশে সাঁজোয়া যানসহ বিপুল পরিমান দাঙ্গা পুলিশ আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রতিনিধি দল এই ঘটনার ব্যাপারে প্রশাসনকে অবগত করলে, উপাচার্য ও ম্যাজিস্ট্রেট তাদের নির্দেশ ছাড়া কোনও পুলিশি আক্রমন হবেনা বলে আশ্বস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে সকল দাবী মেনে নিয়ে অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য ১৫ মিনিট সময় বেঁধে দেন। কিন্তু প্রতিনিধি দল উপাচার্যের বাসভবন থেকে আন্দোলনস্থলে রওনা হওয়ার দুই

মিনিটের মধ্যেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশের ছোঁড়া রাবার বুলেটে আটজন শিক্ষার্থী আহত হন এবং টিয়ার গ্যাসে আহত হন অসংখ্য শিক্ষার্থী। যার মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত তিনজনকে পরবর্তীতে দ্রুত অস্ত্রোপচারের আশ্রয় নিতে হয়। আহত একজন শিক্ষার্থী মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার ফলে তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে। বর্তমানে সেই শিক্ষার্থী একজন নিউরোসার্জনের নিবিড় তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছেন। এছাড়াও মুখে ও হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়া একজন শিক্ষার্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

পুলিশি আক্রমণের খবর পেয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি দলের একটি অংশ পুনরায় উপাচার্যের বাসভবনের দিকে ফিরে এলে তারা ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনওকে পালিয়ে যেতে দেখেন। এই ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করার পরপরই প্রশাসনেরই নির্দেশে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায়, যা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি ভয়ানক প্রতারণা হিসেবে আবির্ভূত হয়। সারা দিনে বহুমুখী হামলার শিকার হবার পর দিন শেষে এমন নৃশংস নির্বিচার হামলা শিক্ষার্থীরা মেনে নিতে পারেনি। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে সংগঠিত হয়ে উপাচার্যের বাসভবন অভিমুখে যাত্রা করে জবাব চাওয়ার জন্য। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনভাবেই উপাচার্যের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। এক পর্যায়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ সহ দুইজন শিক্ষক বাইরে বেরিয়ে আসলে সবাই তাদের ঘিরে ধরে এবং হামলার জবাব চায়। তারা কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য দিতে না পারায় ছাত্ররা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে যায়, এবং এসময় কিছু শিক্ষার্থী সবাইকে শান্ত করে শিক্ষক দুইজনকে বেরিয়ে যেতে দেন।

কালক্ষেপণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের বিক্ষুব্ধতাও বাড়তে থাকে। প্রায় দুই ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও পুলিশি হামলার ব্যাখ্যা দিতে উপাচার্য কিংবা প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ শিক্ষার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে না আসায় উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের বিক্ষুব্ধতার বহিপ্রকাশ ঘটে এবং উপাচার্যের বাসভবনের বহির ফটকের দরজা খুলে তারা বাসভবনের উঠোনে অবস্থান নেয়। এসময় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের সহায়ক কিছু শিক্ষকদের সম্মুখীন হন যারা উপাচার্যের বাসভবনের মূল দরজা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা বারবার ছাত্রদেরকে আশ্বস্ত করতে থাকেন যে আর দশমিনিট পর উপাচার্য সাক্ষাৎ করবেন, আর বিশ মিনিট পর করবেন, আর পাঁচ মিনিট পর করবেন এবং এভাবে আশ্বস্ত করার নামে কালক্ষেপন চলতে থাকে। শিক্ষকদের এরূপ আচরণে ছাত্রদের ক্ষুব্ধতা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে এবং তারা শিক্ষকদের সামনে ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করে। তিন ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশি হামলার কোনও প্রকার ব্যাখ্যা না পেয়ে প্রবল হতাশা ও মনোবেদনায় কিছু শিক্ষার্থী উত্তেজিত হয়ে আনুমানিক পাঁচটি ফুলের টব ও একটি জানালার কাঁচ ভাংচুর করে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের বাকি অংশ তাদের নিবৃত করার চেষ্টা করে।

ইতোমধ্যে উপাচার্যের বাসায় আগত অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা ছয় বার শিক্ষার্থীদের উপাচার্যের সাথে সাক্ষাতের আশ্বাস দেন। প্রায় অর্ধশত শিক্ষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ প্রশমনের কোনও উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করেননি। উপরন্তু কিছু সংখ্যক শিক্ষক আন্দোলনকারীদের ছবি তুলে ও কটুক্তি করে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করেন। কোনও কোনও শিক্ষক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত তোলেন। উপাচার্যের ব্যক্তিগত চিত্রগ্রাহক আন্দোলনকারীদের ছবি তুলতে থাকলে একজন আন্দোলনকারী ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বাধা প্রদান করতে গেলে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। অপেক্ষার বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় কিছু শিক্ষার্থী উপস্থিত শিক্ষকদের ভূমিকার প্রতিবাদে তাদের দিকে পুলিশের বুলেটের প্রতীকী বিপরীত হিসেবে ফুল ও পানি নিক্ষেপ করে। এরই মধ্যে কালক্ষেপণ ও টালবাহানায় উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের পেছন থেকে কে বা কারা উপাচার্যের বাসভবনের ফটক তাক করে উপাচার্যের ভাষায় একটি 'ভালো সাইজের কাঁঠাল' ও একটি পোড়ামাটির টুকরা নিক্ষেপ করে পালিয়ে গেলে উপস্থিত শিক্ষকদের দুইজন আহত হন বলে দাবি করেন। যদিও পরবর্তীতে যোগাযোগ করা হলে তাদের কেউই গুরুতর আহত হননি বলে স্বীকার করেছেন।

প্রায় অর্ধশত শিক্ষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ প্রশমনের কোনও উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করেননি। উপরন্তু কিছু সংখ্যক শিক্ষক আন্দোলনকারীদের ছবি তুলে ও কটুক্তি করে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করেন।

এরপর রাত আনুমানিক ৮টায় ক্যাম্পাসের দুইটি প্রধান ফটকে প্রায় ১০টি গাড়িতে করে পুলিশ অবস্থান নেয়, এ খবর শুনে কিছু শিক্ষার্থী আতঙ্কিত হয়ে উপাচার্যের বাসভবন ত্যাগ করে। কিন্তু বাকিরা তাদের যৌক্তিক অবস্থান তথা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। পুলিশ এসে ভেতরে অবস্থানরত ৪২ জন শিক্ষার্থীকে মধ্যরাত পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখে, এবং এক পর্যায়ে ৪২ জন শিক্ষার্থীকে লাঠি চার্জ করে পুলিশের গাড়িতে তুলে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় যাদের মধ্যে ১২ জন ছিল নারী। গ্রেফতারের পর পুলিশের হাতে আরেক দফা নিগ্রহের শিকার হতে হয় শিক্ষার্থীদের। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজে বাদী হয়ে ৩১ জনের নাম উল্লেখপূর্বক আরো ৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা দেখিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করে, যা আমলে নিয়ে পুলিশ পরবর্তীতে হত্যাচেষ্টা (ধারা ৩০৭, ৩২৪, ৩২৬) রাষ্ট্রদোহীতা (ধারা ১৪৩) সহ মোট দশটি ধারায় মামলা দায়ের করে।

সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন ও পুলিশের হামলার ফলে যে তীব্র বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, সেটি দমাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে নিপীড়নমূলক ভূমিকাটি নিল সেটিকে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের নগ্ন প্রকাশ ছাড়া আর কোন নামেই অভিহিত করা যায় না। উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক শিক্ষার্থী এমন কি শিক্ষকের মৃত্যুর পরেও আশ্বাস ব্যতীত প্রশাসনের কার্যকর কোনও পদক্ষেপ না থাকায় মৃত্যুর মিছিল থামেনি। অপরিকল্পিত সড়ক নির্মাণ, অদক্ষ ও বেপরোয়া চালক

বাংলাদেশের মহাসড়কগুলোকে একেকটি মৃত্যু ফাঁদে পরিণত করেছে। বর্তমানের মতো প্রতি বছর ঈদের সময়গুলোতে সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরে যায় অনেকগুলো তাজা প্রাণ, যে সড়ক দুর্ঘটনা প্রাতিষ্ঠানিক গাফিলতিরই ফলাফল। ফলে নিরাপদ সড়কের দাবী আদায়ের ভাষা মিছিল মানববন্ধন থেকে সড়ক অবরোধে রুপান্তরিত হয়।

অন্যদিকে মহাসড়কের অন্তত একটি অংশে মৃত্যুর মিছিল থামানোর জন্য চলা আন্দোলন-অবরোধকে কতিপয় ক্ষমতাসীন দলঘেঁষা মিডিয়া জনদুর্ভোগ হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টা করেছে যার সাথে পুলিশ প্রশাসনের ভাষার কোন অমিল নেই। পুলিশ প্রশাসনও যথারীতি এটিকে অভিহিত করেছে জনদুর্ভোগ হিসেবে। তবে কোন ন্যায্য কারণ ছাড়াই যখন শুধুমাত্র ভিআইপিদের চলাচলের জন্য একটি গোটা শহর অচল করে দেয়া হয় তখন এই প্রশাসনের মুখে টু শব্দটিও শোনা যায়না। এখানে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও হয়ে দাঁড়ায় সরকারী প্রশাসনের আজ্ঞাবাহী। প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতা কাঠামোর চরিত্র অনুযায়ী একে অপরের হয়ে তারা কাজ করে। যেমন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন একাকার হয়ে গেছে, যদিও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ধারণার সাথে তা সাংঘর্ষিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পুলিশ প্রশাসনের 'সখ্যতার' আরও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলার মধ্য দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের প্রতিনিধির সাথে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দলের আলাপকালে অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য পনেরো মিনিট সময় বেঁধে দেয়ার পরেও দুই মিনিটের মাথায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বর্বরোচিত পুলিশি হামলার ব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তাসহ প্রায় ১০ জন শিক্ষার্থী রাবার বুলেট ও টিয়ারশেলে গুরুতর আহত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশের হামলার প্রতিবাদ জানায়নি। বরং রাবার বুলেট বিদ্ধ তিনজন শিক্ষার্থীর জরুরি অস্ত্রোপচার ও অন্যান্য চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতেও গড়িমসি করেছে।

অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া হামলা হবেনা জানিয়ে আশ্বস্ত করার পরেও যেভাবে বেঁধে দেয়া সময় শেষ হওয়ার বহু আগেই পুলিশ হামলা পরিচালিত হল সেটি শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশাসনের এক নির্মম প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা পুলিশি হামলার ব্যাখ্যা চাইতে উপাচার্যের অফিস ও বাসভবনে গেলে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনওর পালিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে উপাচার্যের শিক্ষার্থীদের সামনে না আসা– এই দুই ঘটনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মদতেই যে পুলিশ হামলা চালিয়েছিল সে ব্যাপারটিই পরিস্কার হয়। আবার, বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ না করে উপাচার্যের বাসভবনের দেয়াল সেজে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকরা ক্ষমতার প্রতি নিজেদের আজ্ঞাবহতাই প্রকাশ করেছেন। পুলিশি হামলায় শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীদের পাশে না থেকে উল্টো এসব আজ্ঞাবাহী শিক্ষকরা যেভাবে প্রশাসনের প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সেটি শিক্ষার্থীদের ক্ষোভকে আরও উস্কে দিয়েছে। মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে পুলিশ এনে ১২ জন নারী শিক্ষার্থীসহ যেভাবে ক্যাম্পাসের ৪২ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করালো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেটি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সম্ভবত নজিরবিহীন। বর্তমানে মিথ্যা মামলার তদন্ত কাজের নামে পুলিশের ঘুষ আদায়, আরও মামলায় ফাঁসানোর হুমকি ও মানহানির শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে পুলিশ এনে ১২ জন নারী শিক্ষার্থীসহ যেভাবে ক্যাম্পাসের ৪২ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করালো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেটি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সম্ভবত নজিরবিহীন। বর্তমানে মিথ্যা মামলার তদন্ত কাজের নামে পুলিশের ঘুষ আদায়, আরও মামলায় ফাঁসানোর হুমকি ও মানহানির শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের উপর এই প্রতিহিংসাপরায়ন আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের যে শিক্ষার্থীবিরোধী পরিবেশ তৈরি হয়েছে তারই ফলাফল। দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবে অদক্ষ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও প্রশাসক নিয়োগ, জাকসু না থাকা ইত্যাদি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনকেন্দ্রিক ক্ষমতালোভী কিংবা ক্ষমতার আজ্ঞাবহ একটি চক্র তৈরী হয়েছে যাদের ভাবনা জগতে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের চেয়ে স্বীয় ও সরকারি দলের কল্যাণ-ভাবনার বিচরণ বেশি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী কাঠামো অর্থাৎ সিনেটে কোনও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নেই বিধায় প্রশাসন স্বেচ্ছাচারী হয়ে শিক্ষার্থীদের উপর নিপীড়ন চালানোর সুযোগ পাচ্ছে। যার প্রতিফলন সর্বশেষ সিনেট সভায় দেখা গেছে। সভায় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা শিক্ষার্থীদের উপর আনীত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানালে তিরস্কার হিসেবে উপাচার্য তাদেরকে 'ছাত্রপক্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে শিক্ষার্থীদের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে ভাবেন এই ঘটনাটি তারই প্রমাণ। ফলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর আনীত মিথ্যা মামলাটিকে 'ছাত্রপক্ষকে' শায়েস্তা করার জন্য প্রশাসনিক সন্ত্রাসের একটি হাতিয়ার বা নমুনা হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রশাসন (যেখানে আদতে প্রায় সবাই শিক্ষক) বনাম শিক্ষার্থী এরকম দ্বান্দ্বিক অবস্থা তৈরী করা হলে সেটি কোন বিচারেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভাল কিছু হতে পারে না।

মালিহা মোস্তফা সূচনা, অলিউর সান, সরদার জাহিদ, নজির আমিন চৌধুরী জয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী